বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি

গোলাম কুদ্দুস

(১)

উমাদিকে স্মরণ করা মাত্র আমার কথাটা মনে উদিত হয়। উমাদির চরিত্র যেন হুবহু ওরই জীবন্ত প্রতিফলণ।

উমাদি যে-যুগে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, সেটা ছিল পরাধীনতার যুগ। তখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাদেশিকতা এবং সাম্যবাদের আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, এবং ছিল ব্যাপক, নির্মল, অনাবিল। বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আকর্ষিত হত মহৎ আদর্শের রাজনীতির দিকে। ওটা ছিল আত্মবিকাশেরই একটা দিক। তখন দেশের প্রধান দল হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের কোনো পৃথক ছাত্র-সংগঠন ছিল না। বেঙ্গল স্টুডেন্ট ফেডারেশন ছিল নানা মতের একমাত্র ছাত্র-সংগঠন। উমাদির মতই "পথের পাঁচালী"র সর্বজয়া অর্থাৎ করুণা দি'ও হয়েছিলেন কমিউনিস্ট। উভয়ের জীবনসঙ্গী, যথাক্রমে, চিন্মোহন সহানবিশ এবং সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছাত্র-আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট হন।

(২)

পারিবারিক দিক থেকে উমাদি শিক্ষাব্রতী পিতার কন্যা। তাঁর বাবা ছিলেন একাধারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক এবং ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য। আমি আমার ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও সিটি কলেজের নীতিবাগীশ, অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয় সম্বন্ধে যে সব গালগল্প শুনে ব্রাহ্ম সমাজের কঠিন রসকসহীন চিত্র মনের মধ্যে এঁকেছিলাম, তার সঙ্গে উমাদির পরিবারের আদৌ কোনো মিল ছিল না। উমাদির বাবা সমাজের গুরুগম্ভীর আচার্য হওয়া সত্ত্বেও যে কী রকম রসিক পুরুষ ছিলেন, একবার তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। আজও তার সাক্ষ্যবহন করছে আমার 'ইরাকে ঈগল' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত নিম্নোক্ত গদ্য কবিতাটি —

"গিয়েছিলাম অক্সফোর্ড ফেরতের বাড়ি,
জাতের বিচারে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মণ,
কিন্তু রসিকতা করে নিজের বাবাকে বলতেন চাঁড়াল,
যেহেতু ব্রাহ্ম-সমাজের মান্যগণ্য আচার্য হয়েও
তাঁর বাবার মুখটা ছিল আলগা।
দোতলায় ড্রয়িং রুমে ঢুকে তাঁর সেই পিতৃদেবকে দেখলাম
জানালার নীচে কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে অনর্গল বকছেন —
আপনি কি পাশের বাড়িতে থাকেন ম'শায়?
আপনার সাক্ষাৎলাভে বিমল আনন্দ পেলুম,
রোজ আসবেন কিন্তু, আমার দিকেও মুখ তুলে তাকাবেন।
না, না যা করছেন তাই করুন,
ঘাস খাওয়া ভালো, বিশেষত আপনাকে যখন

ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে হয়, তখন ঘাস খাওয়া প্রয়োজন.....

আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, আচার্যদেব যার সঙ্গে

কথা বলছেন, সে একটা মোটা তাজা ছাগল!

তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন—

আরে, তুমি! বসো, বসো।

আমি বললাম, আপনিও তো একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন,

তিনি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, সেই ভুলেরই তো

এতক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত করছিলাম।"

উপরোক্ত অক্সফোর্ড-ফেরত হচ্ছেন শ্রী নিখিল চক্রবর্তী, যিনি উমাদির বড়দা, যিনি বিলেতে পড়তে গিয়ে কমিউনিস্ট হন, যিনি ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী রেণু রায়কে (চক্রবর্তী) বিয়ে করেন (রেণুদিও বিলেতে পড়তে গিয়ে কমিউনিস্ট হন)। উভয়ে দেশে ফিরে প্রথমাবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। এ-হেন শিক্ষাব্রতীদের পরিবেশেই উমাদির অবস্থান ছিল।

শুনেছি রেণুদি কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে অকৃতদার ডঃ রায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। যিনি জীবনের সর্ববিধ ভোগের সুযোগ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে এনে দুঃখী সর্বহারাদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করেছিলেন তাঁর কাছে সম্পত্তি নামক জিনিসটা ছিল বাহুল্য। এইরকম ত্যাগ এবং পবিত্রতার পরিবেশ উমাদি লাভ করেছিলেন।

(৩)

বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে, আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে, শ্রী চিন্মোহন সেহানবিশ আমার সঙ্গে উমাদির পরিচয় করিয়ে দেন মহম্মদ আলি পার্কের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। প্রথম সাক্ষাতে মনে হয়েছিল, এ যেন শ্মশানে ফুটন্ত গোলাপ! কেন মনে হয়েছিল?

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ঐ বয়সেই ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখকশিল্পী সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক। উপরোক্ত অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্ঘ অবিভক্ত বাংলার শহর ও পল্লীসংস্কৃতিকে এই সর্বপ্রথম যুগলবন্দী করার চেষ্টা করে। আমাদের আয়োজন ছিল বিপুল। সরোজিনী নাইডু আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন। এই সম্মেলনে আমরা সদ্য-ঘটে-যাওয়া বাংলার মহামন্বন্তরের একটা চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করি। বন্ধুবর জয়নুল আবেদীনের দুর্ভিক্ষের উপর আঁকা ছবির সুনাম তখন তুঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে ছবি সংগ্রহের ভার পড়েছিল আমার উপর। জয়নুল বললেন, আমার সব ছবি তো একটা এক্সিবিশনে বিক্রি হয়ে গেছে! শুনে আমি অবাক! দুর্ভিক্ষের ছবির এত কদর? আমাকে আরো বিস্ময়াভিভূত করে বন্ধুবর বললেন, জানেন, বিড়লারাও কিনেছে! আমি থ! জয়নুল ঈষৎ হেসে বললেন, আমারও বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, শিল্পী-জীবনে এই আমার প্রথম উপলব্ধি — শিল্প সর্বত্রগামী। চালের চোরাকারবারীরাও হয়তো কিনেছে! যাই হোক, আমি অভিনেত্রী কানন দেবীর কাছ থেকে এক সপ্তাহের মেয়াদে দু'খানা জয়নুল চিত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। অবশেষে, সমবেত চেষ্টায় আমরা সব খ্যাতনামা শিল্পীর কাছ থেকেই তাঁদের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবি পেয়েছিলাম। ফলে, চিত্র-প্রদর্শনী বেশ জমকালো হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দর্শকদের মনে হতে পারত একটা মমবিদারী জগতে দাঁড়িয়ে আছি। সেই শ্মশানভূমিতেই শ্রী চিন্মোহন সেহানবিশ দর্শনার্থী উমাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তাঁকে দুর্ভিক্ষের ছবির মাঝখানে প্রাণের হিল্লোল বয়ে আনা ফুটন্ত গোলাপ বলে মনে হয়েছিল। রূপ হয়েছিল অপরূপ।

কেউ হয়ত ভাবতে পারেন এ অত্যুক্তি। আমারই দৃষ্টি বিভ্রম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? তাঁরও কি দৃষ্টিভ্রম ঘটেছিল? উমাদি প্রথমবার রবীন্দ্র-সদর্শনে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা-ভাইদের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার যান শান্তিনিকেতনে চিনুদার সঙ্গে। উমাদি মৃত্যুর কিছুকাল আগে কথাপ্রসঙ্গে আমাকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করে বলেন, 'দেখুন ওঁর কী আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি! আমাকে দেখে বললেন— 'তুমি আর একবার এসেছিলে, না?' আমি তো অবাক! আমার মত একটা অতি সাধারণ লোককে উনি মনে রাখতে পেরেছেন।

আমি উমাদির কথায় হেসেছিলাম।

— হাসছেন কেন? উমাদির এই প্রশ্নের আমি জবাব দিইনি। কেননা, উমাদির সামনে কী করে বলব— স্মৃতিশক্তির জোরে নয়, রূপের পূজারী বলেই তাঁর গুরুদেব তাঁকে মনে রেখেছেন।

বাংলার বহু চলচিত্রকার উমাদিকে সিনেমা জগতের দিকে টানতে চেয়েছিলেন রূপে আকৃষ্ট হয়ে। উমাদির কাছ থেকে তাঁরা সাড়া পান নি। উমাদির সঙ্গে যিনি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সেই চলচিত্রকার সত্যজিৎ রায় উমাদিকে বিলক্ষণ জানতেন, তাই উমাদিকে টানার কোনো চেষ্টা করেননি। শিক্ষাব্রতী উমাদিকে তিনি চেয়েছিলেন বরং স্বীয় পুত্রের শিক্ষাদানের কাজে। অনেক সাধ্য-সাধনায় উমাদিকে সে কাজে পেয়েও ছিলেন।

উমাদির পূর্বতন আলোচ্য রূপ বেশিকাল কিন্তু টেকেনি। টেকার উপায়ও ছিল না। বাংলার 'রূপকার' ডঃ বিধানচন্দ্র রায় উমাদির রূপ টিকতে দেন নি। ব্যাপারটা হেঁয়ালি ঠেকলেও সত্যি!

(৪)

ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বল্পকালের ব্যবধানেই তিনি এ রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। রাতারাতি পার্টির দৈনিক পত্রিকা বন্ধ হয়, যাবতীয় অফিস পুলিশী হেফাজতে চলে যায়, শত সহস্র কমিউনিস্ট জেলখানায় চার দেয়ালের মধ্যে প্রেরিত হন।

বিনা অপরাধে উমাদির জীবনসঙ্গী চিন্মোহনের মত কমিউনিস্টদের শত সহস্র পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। উমাদিকে গা-ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করতে হল। চিনুদা চালান হয়ে গেলেন সুদূর বক্সা জেলে! চালু হল লাঠিগুলির রাজত্ব। বন্দীদের মুক্তির দাবিতে তাঁদের মা-বোনেরা মিছিল বের করলে বৌ-বাজারের রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁদের উপর বিনা প্ররোচনায় গুলি চালান ডঃ রায়ের পুলিশ। মেরে ফেলা হল চারজন নারীকে — লতিকা-অমিয়া-প্রতিভা-গীতাকে। পাহাড়ঘেরা বক্সা জেল থেকে খবর এলো শতাধিক বন্দী আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন পুলিশী নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য। এদের মধ্যে একজন চিনুদা। উমাদি অন্যদের মতই এদের অনশনের দিন গুণতে শুরু করলেন। দিন যেন আর শেষ হয় না। বিনিদ্র রজনী যাপন করতে করতে উমাদির রূপ কর্পূরের মতো উবে গেল। অনশনের এক মাস পর চিনুদার মৃত্যুর প্রহর গোনা হচ্ছিল তাঁদের স্বজনদের ঘরে ঘরে। বৃটিশ আমলে যতীন দাশ অনশনের ৬৩ দিনের মাথায় মারা যান। বক্সার বন্দী অনশন চলেছিল পুরো ৬১ দিন। তদুপরি বক্সা জেলে পুলিশ বন্দীদের লাঠিপেটাও করেছিল। চিনুদা মেরুদণ্ডে সেই যে নিদারুণ লাঠির আঘাত পান, সারাজীবন তার যন্ত্রণা ভোগ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কলকাতার হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল, ডঃ রায়ের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করাটাই ছিল বে-আইনী কাজ!

কমিউনিস্ট পার্টি আবার আইনসম্মত কাজকর্ম শুরু করল, বন্দীরা জেল থেকে ছাড়া পেল। কিন্তু মাঝখানে কী প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতিই না হয়ে গেল। উমাদির পিতৃগৃহে সদ্য বক্সা-প্রত্যাগত চিনুদাকে দেখতে পেলাম। সেহানবিশ-দম্পতির চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। দেব এবং দেবী কী ছিলেন, আর কী হয়েছেন!

বক্সা জেল থেকে চিনুদার প্রত্যাগমনের আগে শ্রী হিরণ সান্যাল মহাশয় আমাদের কাছে প্রায়শ একটা রসিকতার পুনরাবৃত্তি করতেন — 'জানো, আমি একটা বই লিখব যার নাম হবে — Rise and Fall of Brahmo Samaj from Rammohan to Chinmohan'। বক্সা পর্বের পর চিনুদা-উমাদির প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, নিজের বাক্যালাপে প্রায়ই তিনি 'উমা বলছিল' বলে উমাদির মতামতটা শোনাতেন আমাদের। তাঁর এই 'উমা বলছিল' মুদ্রাদোষ নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। বক্সা-পর্বের পর আমরা সে হাসাহাসিও বন্ধ করেছিলাম।

ডাঃ রায় কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না। এবার এলো তাঁর 'বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব'! পশ্চাদ্বপদ বিহারের সঙ্গে অগ্রসর পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে দিয়ে প্রগতিশীল আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনকে দমনের জন্য বাংলার জাতিসত্ত্বা মুছে দিতে হবে? উত্তর কলকাতার নির্বাচনের মোহিত মৈত্রের জয় এবং কংগ্রেস-প্রার্থীর পরাজয়ে এবারও ডাঃ রায় পিছু হটতে বাধ্য হলেন। তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রথার ঢং-এ বিরোধীপক্ষের নেতাকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুবিধাদি দানের প্রস্তাব করেন। কমিউনিস্টরা তা প্রত্যাখান করে। উমাদি-চিনুদাদের দল অনেক আগেই বুঝেছিল, দুর্গাপুর-দীঘা-কল্যাণী-সল্টলেক উন্নয়নের আড়ালে ডাঃ রায় পুরোদস্তুর বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আত্মনিয়োগ করেছিল, বলাবাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে উমাদি-চিনুদাদের মত লোকের আত্মত্যাগের ফলে ডাঃ রায়ের সেই স্বপ্ন সফল হয়নি। বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছে।

(৫)

উমাদি যে 'সাউথ পয়েন্ট' স্কুলের বাণিজ্যিক শিক্ষাদানের প্রতিবাদে তাঁর সেখানকার স্থায়ী নিরাপদ চাকুরী ছেড়ে নিরুদ্দেশে আদর্শের টানে যাত্রা করেছিলেন, এই চ্যালেঞ্জ বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, উমাদি তখন ছিলেন কপর্দকহীন।

উমাদি বামপন্থী সরকারের শিক্ষানীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একমত ছিলেন না। আমি তাঁকে বলেছিলাম, এ-বিষয়ে প্রধান শাসকদলের মধ্যেও সকলে একমত নন। আমার বন্ধু মনসুর হবীবুল্লাহ, যিনি একদা আইনমন্ত্রী এবং দীর্ঘকাল স্পীকার ছিলেন, তিনি নিজেদের সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে একটি বই লিখেছেন। শুনে উমাদি খুশি হয়ে বলেছিলেন, মনসুর সাহেব আমার পুরানো বন্ধু, তাঁকে বলবেন আমি বইটি পড়তে চাই।

মনসুর সানন্দে উমাদিকে একটি বই উপহার দিয়ে উমাদির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। মনসুর উমাদির মতই কলকাতার কুদঘাটে 'ওয়েস্ট পয়েন্ট' নামে একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। উমাদি ও মনসুরের মত দুই শিক্ষাব্রতীর সাক্ষাৎ ঘটলে আমি ওদের আলোচনা শোনার সুযোগ পেতাম।

একদা উমাদি 'পাঠভবন' নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন, আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি তো অনায়াসে আপনার জ্যোতিদার (শ্রী জ্যোতি বসু) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। উমাদি বলেন, আমি নিজে থেকে জ্যোতিদাকে কিছু বলব না।

এককালের ঘনিষ্ঠতাকে কাজে লাগাতে উমাদির মর্যাদাবোধ বাদ সেধেছিল।

একটা ব্যাপারে উমাদিকে খুব খুশি হতে দেখেছিলাম। ওঁর মা বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। যখন ঐ কলেজের শতবার্ষিকী পালিত হয়, তখন জীবিত ছাত্রীদের মধ্যে উমাদির মা ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠা, তাঁকেই শতবর্ষের শতপ্রদীপ জ্বালানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উমাদি অতি আনন্দে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বেথুন কলেজে গিয়েছিলেন।

উমাদির বাসায় একটি রাত্রি-যাপনের ঘটনা আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সেহানবিশ-দম্পতির আতিথ্য সে রাত্রে আমাকে ভিন্ন এক কলকাতার আস্বাদ দিয়েছিল। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই রাত্রে বোধ করি কলকাতার দাঙ্গা তুঙ্গে উঠেছিল। আমি একটা জরুরী ব্যাপারে সে রাত্রে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ হয়ে শ্যামবাজারে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। পথে ট্যাক্সি থেকে বৌ-বাজার ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলের নিকটবর্তী কলাবাগান বস্তিটির সামনে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তাতেই মনে হয়েছিল হতদরিদ্র্য বস্তিটির অস্তিত্ব সেই রাত্রেই মুছে যাবে। যাই হোক, শ্যামবাজার থেকে রাত দশটায় ফেরার সময় সমস্ত যানবাহন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে পদব্রজে বেগবাগানে স্বীয় আস্তানায় পৌঁছানোর জন্য রওয়ানা দিতে হয়েছিল। পথের ভয়ঙ্কর বর্ণনা আমি করব না। দেড়ঘন্টার চেষ্টায় বাসার নিকটবর্তী হয়ে শুনলাম আর এগুনো চলবে না—কার্ফু জারী হয়েছে। বাসায় ঢোকার উপায় নেই, এত রাত্রে কোথায় যাই? নিকটবর্তী মিন্টোপার্কের বেঞ্চির শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু পুলিশের টর্চের আলো বারবার মুখের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত চমকে যেতে লাগল। বুঝলাম অল্পক্ষণেই থানার লকআপে আমার গতি হবে। তাহলে কী করণীয়? এ ব্যাপারে পাঠককে আমি আমার কাব্যগ্রন্থ "কুসুমিকা ও বহ্নিশিখা" থেকে কিছু কিছু পংক্তি উপহার দেব ঃ

"আচমকা স্মৃতিপথে ভেসে উঠল একখানি মুখ।
সেই মুখ চুম্বকের মত টানল প্রবল টানে—
চলে এসো, চলে এসো, দ্বিধা কেন?
আমার শ্রান্তি ক্লান্তি উবে গেল,
তবে যেতে হবে আরো প্রায় দু'মাইল,
সেটা তেমন কিছু নয়, শুধু ভয়।
সমীচীন হবে কিনা এত রাতে কারো দ্বারে করাঘাত করা।

....

"সহজেই ফুরাল দীর্ঘপথ
সম্মুখে নিঃঝুম নীরব শান্তপল্লী
গৃহে গৃহে বন্ধ দ্বার
চতুর্দিকে আধো অন্ধকার।
শুধু সেই বাড়িটায় এত রাতে জ্বলছে কেন আলো?
দরজাও খোলা!
বুক থেকে নেমে গেল মস্ত ভারী বোঝা —
কড়া-নাড়া বেল-বাজানো থেকে এমন সহজ নিষ্কৃতি!
ওখানে কি চলছে কোনো উৎসব?
কারা যেন চলে যাচ্ছে অস্পষ্ট ছবির মত!
গৃহস্বামী আমাকে দেখামাত্র বিস্ময় ব্যাকুল—
"আরে, তুমি! এত রাত্রে! কী ব্যাপার?

তোমার পাড়ায় খারাপ কিছু ঘটেছে কী?
ঈশ্, একটু আগে ওরা চলে গেল,
তোমাকে দাঙ্গার রাতে দেখলে দারুণ খুশি হত!
ওদের সঙ্গে কী ঠিক হল জানো?
কালই বের হবে আমাদের শান্তির মিছিল।
আর, হ্যাঁ, সিনেমারও কেউ কেউ এসেছিল।
সবাই দায়িত্ব নিয়ে গেছে।
আশা করি মিছিলের আগে শহরে বড় কিছু ঘটবে না।"
"আশার ছলনা চিনুদা, মনে হচ্ছে ঘটে যাবে আজ রাতে
বড়সড় একটা খাণ্ডবদাহ।"
"কী করে বুঝলে? মাথা ঠাণ্ডা করে রাতে ঘুমাও তো,
আর শোনো, ভোরে উঠে চা না খেয়ে পালিয়ো না।"
কিছুক্ষণ পরে গৃহের গৃহিণী দিদিমণি
পাঠভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী যিনি সেই উমাদি
নেটের মশারী হাতে উপস্থিত।
বললাম, "উমাদি, মনে রাখবেন
আমার চেয়ে বয়সে চারদিনের ছোট আপনি।'
কেন এমন সময়ে এমন কথা বললাম নিজেই জানি না।
শুয়ে পড়ে আবার নিজেকেই বললাম, কেউ আমায় ঘুমোতে বলো না।
মশারীর ঘরে আমি তো আছি বেশ,
ওদিকে অনেক ঘর হয়তো এই মুহূর্তের পুড়ে হচ্ছে খাক,
বলো কী করে ঘুমাই?
অন্য এক কলকাতায় কোন পেয়ে তবু
অচিরেই গাঢ় ঘুমে অচেতন!"

....

"বুকের মধ্যে অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি ছিল নিশ্চয়!
নইলে তড়াক ক'রে উঠব কেন লাফ দিয়ে প্রায়
রাত না পোহাতেই!
নইলে এমন সুহৃদদের না জানিয়ে
ছুটব কেন ফার্স্ট ট্রিপের বাস ধরতে!

অজানা কেউ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হিড়হিড়িয়ে!
বস্তি নামক বস্তুটাই আমাকে ডাকছে!
আকাশ বাতাস মাতাল করে ডাকছে আমাকে!
যাত্রীবিহীন রাস্তা দিয়ে বাসটা যেন উড়ে যাচ্ছে পক্ষীরাজ!
রাত্রের সেই বস্তিটার কাছে পৌঁছে গেলাম ঊষা লগ্নেই!
কিন্তু কোথায় বস্তি? সেই কলাবাগান বস্তি?
পোড়া বস্তুপিণ্ড হয়ে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে!
তাজমহল দেখতে যায় লোকে জ্যোৎস্নায়,
আমি এসেছি ঊষার-পবিত্র স্নিগ্ধ আলোয় দেখতে
অগ্নিদগ্ধ ভস্মীভূত মানবতার এ কী বীভৎসতা!
কোথাও নেই জনপ্রাণী, আছে শুধু চাপ চাপ রক্ত!
দমকলের জলও কি স্বল্প ছিল? পোড়া কাঠে এখনো উঠছে ধোঁয়া।
আজ উমাদি-চিনুদাদের সেই শান্তি মিছিল
বের হওয়ার কথা আছে না?
একটু কি বিলম্ব হল না?"

....

তবু সেদিন বিরাট শান্তি মিছিল বের হয়েছিল।
তবু দেরীতে হলেও কলকাতার দাঙ্গা প্রতিহত হয়েছিল।
তবু কলাবাগান বস্তি আবার ভস্ম থেকে
দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আমি সারাজীবন দেখেছি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিছিল হোক, আর বিশ্বশান্তির মিছিলই হোক, যেখানেই শান্তির সমাবেশ, সেখানেই চিনুদা-উমাদি। ওঁরা যেন শান্তির দূত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। আজ আমি আছি, ওঁরা কেউ নেই। আমার শিক্ষাব্রতী স্ত্রী হেনা মৈত্রের সঙ্গে উমাদির সহজ সখ্যতা ছিল, তিনিও নেই। স্ত্রী-বিয়োগে উমাদি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী দিয়ে — আছে দুঃখ, আছে শোক, তবু আনন্দ আছে।

কিন্তু চিনুদার মৃত্যুর দশম বার্ষিকীতে যখন বিস্মৃতপ্রায় চিনুদার স্মরণে ফুল নিয়ে উমাদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, যখন নির্জন ঘরে উমাদির সঙ্গে আর কেউ ছিলেন না, ঠিক সেই মুহূর্তে উমাদি হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন —বুকের ভিতরটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

উমাদিও আর সবার মতই রক্ত মাংসের মানুষ। তাই শেষের দিকে নিজের চেপে রাখা এত দিনের গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন নি।